জলবায়ু পরিবর্তন ও পুঁজিবাদের মুনাফা লিপ্সা

।। ভ্যানগার্ড প্রতিবেদক।।

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ বানের জলে ভাসে। মাঝে মাঝে বড় বন্যাও হয়। তবে এ দুর্যোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় ক্ষণস্থায়ী। বন্যার পানি সরে যায়, মানুষ আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়। তার পরও বন্যা আমাদের, বিশেষ করে গরীব মানুষদের, কাছে এক উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ইদানিং এক আশংকার কথা বলছেন, যা আরও উদ্বেগের বিষয়। তাদের অনেকের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় ১৭ ভাগ এলাকা স্থায়ীভাবে পানিতে তলিয়ে যাবে, দেশের প্রায় তিন কোটি মানুষ চিরতরে উদ্বাস্তু হবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা দুনিয়াই আজ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে। ধ্বংস হতে চলেছে আমাদের বাসভূমি শস্য-শ্যামলা পৃথিবী – এমনই একটা শোর উঠেছে চারদিকে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গিয়ে পৃথিবীর বহু নিম্নাঞ্চল, কমপক্ষে ৪২টি ক্ষুদ্রদ্বীপ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশসহ সমুদ্র উপকূলীয় অনেকগুলো দেশের নিম্নাঞ্চল ডুবে যাবে। কোটি কোটি মানুষ বাস্তুহারা হবে। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে, আবহাওয়ায় স্থায়ী পরিবর্তন আসবে, গোটা জীবজগতের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। অনেক পরিবেশ বিজ্ঞানী, পরিবেশবাদী সংগঠন ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা এ শোরগোলে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। যদিও এ আশংকার বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা সম্পর্কে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বির্তক অব্যাহত আছে। তবুও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে সামগ্রিকতা রক্ষার জন্য এ আশংকার কথা ধরে নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

কোপেনহেগেন সম্মেলন : পর্বতের মূষিক প্রসব

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে এক তুমুল আলোচিত বিষয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হলেও গত কয়েক বছর ধরে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ জলবায়ু সম্মেলনের পর থেকেই বিশ্ববাসীর নজর ছিল পরবর্তী সম্মেলনের দিকে। সেটাই এবার অনুষ্ঠিত হল ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে। ৭ ডিসেম্বর থেকে নির্ধারিত ১২ দিন পেরিয়ে ১৯ ডিসেম্বর এ সম্মেলন শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ১৯৩টি দেশের সরকারি পর্যায়ের ১৫ হাজার প্রতিনিধিসহ মোট ৪৫ হাজার প্রতিনিধি। শেষ পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন ১১০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। এ এক এলাহি কারবার। কিন্তু ফলাফল কি? পর্বতের মূষিক প্রসবই বলা চলে। কোপেনহেগেন সম্মেলন শেষ হয়েছে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়াই। অনেক দর কষাকষির পর সম্মেলন শেষে বিশ্ববাসীর প্রাপ্তি মাত্র তিন পৃষ্ঠার একটা কাগুজে দলিল, একটা তথাকথিত রাজনৈতিক সমঝোতা।

কোপেনহেগেন ত্যাগের প্রাক্কালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কোপেনহেগেন সমঝোতাকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, কোপেনহেগেনে অর্থবহ অগ্রগতি হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন সাংবাদিকদের বলেছেন, অবশেষে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছি। যদিও পরিবেশ বিজ্ঞানী, বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন এবং আন্দোলনকারী শক্তিগুলো এ চুক্তিতে হতাশা ব্যক্ত করেছে। তারা বলছেন, এতে আশা পূরণ হয়নি। এটি একটি দায়সারাগোছের রাজনৈতিক চুক্তি। এর ফলে কিয়োটো প্রটোকল অব্যাহত রাখাসহ ধনী দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের আইনগত বাধ্যবাধকতার জন্য মেক্সিকো সম্মেলন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ বছরের ডিসেম্বরে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে ১৬তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। ওই সম্মেলনেই বালি অ্যাকশন প্ল্যানের সফল পরিণতি ঘটবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

চার দফা পরিবর্তনের পর কোপেনহেগেন খসড়া টেক্সট চূড়ান্ত করা হয়। ওই খসড়ায় বলা হয়, কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে কিয়োটো প্রটোকলকে আরও শক্তিশালী করা হবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলো সহায়তা প্রাপ্তির ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করবে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে থাকবে। কার্বন নির্গমন হ্রাসের ক্ষেত্রে ভিত্তি ধরা হবে ১৯৯০ এবং ২০০৫ সালকে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো আগামী জানুয়ারি মাসে কে কি পরিমাণ কার্বন হ্রাস করবে তার প্রতিশ্রুতি দেবে। এর ভিত্তিতে কার্বন নির্গমন হ্রাসের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উন্নত দেশগুলো আগামী তিন বছরে ২০১০ থেকে ২০১২ সাল নাগাদ কার্বন নির্গমন হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য স্বল্পমেয়াদে তিন হাজার কোটি ডলার প্রদান করবে। অর্থাৎ প্রতিবছর এক হাজার কোটি ডলার করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেয়া হবে। এ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত ক্ষুদ্র দ্বীপদেশ ও আফ্রিকার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এছাড়া উন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকে অর্থবহ

করার জন্য ২০২০ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদা পূরণের জন্য অভিযোজন ব্যয় নির্বাহে একশ' বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেবে। ২০১৫ সাল নাগাদ এ চুক্তির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। এছাড়া এ চুক্তির আওতায় কোপেনহেগেন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড নামে একটি ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হবে। তাছাড়া প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য 'টেকনোলজি ম্যাকানিজম' প্রতিষ্ঠা করা হবে।

জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন, এ চুক্তিকে আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে। কোপেনহেগেন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠন করতে হবে। কেন এ চুক্তিতে পুরোপুরি অনুমোদন দেয়া হল না – এ প্রশ্নের উত্তর জাতিসংঘের মহাসচিব সরাসরি না দিয়ে বলেন, সম্মেলনে ১৩০টি দেশের নেতারা ছিলেন। সব বিশ্ব নেতা বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি একটি জটিল বিষয়। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি এবং এর পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেছি।

টাইমসের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, কোপেনহেগেন সম্মেলন উপলক্ষে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানসহ এত বিপুল সংখ্যক লোকের সমাবেশ ঘটেছে যে সেখানে ৪০ হাজার ৫০০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত হয়েছে। অন্যদিকে, শুধু বেলা সেন্টারকে সাজানো আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যয় হয়েছে ১২২ মিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশি টাকায় ৮৫৪ কোটি টাকা)। ভিভিআইপিদের থাকা-খাওয়ার খরচ আলাদা। অর্থাৎ কোটি কোটি টাকা খরচ করে আয়োজিত সম্মেলন কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলেও যথেষ্ট কার্বন নিঃসরণ করতে সক্ষম হয়েছে!

বাংলাদেশের ভূমিকা

এ জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল ডুবন্ত বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। যেখানে ভারত থেকে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং অংশ নিয়েছেন মাত্র ৮ জন কর্মকর্তা নিয়ে সেখানে আমাদের পরিবেশ প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারি পর্যায়ে ৯২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। আর বেসরকারি পর্যায়ে আরও তিনশ জন। দি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর ডিজাস্টার রিডাকশনের এক সমীক্ষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশের নাম শীর্ষে উঠে এসেছে। ১৬ ডিসেম্বর সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ তথ্য উল্লেখ করে বলেন, 'বন্যার ঝুঁকিতে বাংলাদেশ প্রথম, সুনামির ঝুঁকিতে তৃতীয়, ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে।' অতএব এ সম্মেলনে বাংলাদেশের দাবি কী? কার্বন নিঃসরণ কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিল্পোন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে বাধ্য করা? না, তা নয়। তিনি বলেছেন, '... এই সম্মেলনে আমাদের ক্ষতিপূরণমূলক আর্থিক সহায়তা দিতে হবে।' অভিযোজনের পুরো অর্থ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই অর্থ অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে ও সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।' তিনি বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুনর্বাসনের দাবিও তুলেছেন।

কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কিছুই বলেন নি, তা নয়। কিন্তু ওই ভাষণ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনসহ অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গে যেসব বৈঠক ও আলাপ-আলোচনায় তিনি অংশ নিয়েছেন, সংবাদ মাধ্যমগুলোর পরিবেশিত তথ্য মতে, সেগুলোতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের কণ্ঠ ছিল সবচেয়ে সোচ্চার আর কার্বন নিঃসরণ কমানো বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠ। সম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, সম্মেলনের পর সারা বিশ্বের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। বাংলাদেশ থেকে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যেসব বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের বরাত দিয়ে সংবাদ বেরিয়েছে, বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতি 'সফল' হয়েছে। বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বলছেন, এ সম্মেলনের রাজনৈতিক চুক্তিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) দাবিগুলোর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

বাংলাদেশের সফলতা বা ব্যর্থতা বোঝার আগে দেখা দরকার বাংলাদেশ কি লক্ষ্য নিয়ে সম্মেলনে গিয়েছিল। এর পাশাপাশি সম্মেলনে বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর ভূমিকাও আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। গত ২৮ নভেম্বর পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী হাছান মাহমুদ সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৭০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। কোপেনহেগেন সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে সংলাপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত গত ৩ জানুয়ারি দৈনিক প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেও এ বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন যে শর্তহীন তহবিল আদায় করাটাই বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে সম্মেলনে যখন বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রণয়ন করার কথা বলা হচ্ছে বাংলাদেশ তখন ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলোর, বিশেষত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীনের পক্ষাবলম্বন করে নিরবতা পালন করেছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি কোপেনহেগেনে বলেছেন, 'আমরা এখনই উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বে যেতে চাই না। তাদের সহযোগিতা নিয়েই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাজ করতে চায়।'

সম্মেলন শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮ ডিসেম্বর গভীর রাতে শুরু হওয়া প্লেনারি সেশনে প্রথমেই বক্তব্য দেন ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র টুভালুর প্রতিনিধি। তিনি বলেন, জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে এ চুক্তি করা হচ্ছে। কিয়োটো প্রটোকলের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিশ্চিত করা হয়নি। এ চুক্তি স্বাক্ষর করা তার দেশের পক্ষে সম্ভব না বলে জানান টুভালু প্রতিনিধি। ভেনিজুয়েলার প্রতিনিধি কোপেনহেগেন সমঝোতার খসড়ার ওপরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাতের বেলা সম্রাটের মতো এসে আমাদের সামনে একটি চুক্তি ছুড়ে দিয়ে গেছেন। এরকম অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনোভাবেই মতৈক্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। প্রস্তাবিত চুক্তিতে কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। এরপর বক্তব্য দিতে গিয়ে কড়া সমালোচনা করে সুদানের প্রতিনিধি লমুম্বা বলেন, কেউ না, ওবামা নয়, এমনকি আপনিও (ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী) আমাদের এ খসড়ায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করতে পারেন না। ১০০ বিলিয়ন ডলার ঘুষ দিয়ে আমাদের মহাদেশকে ধ্বংস করা হবে। সম্মেলনে প্রথম থেকেই মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাশিদ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন; রাতের প্লেনারি আলোচনায় তিনি বলেন, এই খসড়ার প্রতি আমি বারবার আমার আপত্তির কথা জানিয়েছি। এরপর নিকারাগুয়া ও বলিভিয়ার পক্ষ থেকেও খসড়া অঙ্গীকারনামার বিরোধিতা করা হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার কোটি ডলার দেওয়ার প্রস্তাবকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেছেন ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ। তিনি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র যেখানে নিজের দেশের দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকগুলোকে ৭০ হাজার কোটি ডলার দিচ্ছে সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ১ হাজার কোটি ডলার দেওয়ার প্রস্তাব খুবই হাস্যকর'। তিনি আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় দূষণকারী। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীবনহানি যা গণহত্যার শামিল, এর জন্য তারাই দায়ী'। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য দশ বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারের ফাঁপা প্রতিশ্রুতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন প্রতিনিধি বলেছেন, 'এতে আমাদের দাফন-কাফনের খরচও হবে না।' টুভালু, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দ্বীপরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা বলছেন – আমরা ক্ষতিপূরণ চাই না, পুনর্বাসনের নিশ্চয়তাও চাই না। আমরা ডুবতে চাই না, কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী দেশগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ করা। ছোট দ্বীপরাষ্ট্র টুভালু, বাংলাদেশের আগেই যে ডুববে, তার প্রধানমন্ত্রী এ সমঝোতাকে ৩০ খণ্ড রূপার (প্রস্তাবিত ৩০ বিলিয়ন ডলারের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে) বিনিময়ে 'ভবিষ্যৎ বিক্রি'র সঙ্গে তুলনা করে এটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 'টাকার বিনিময়ে আমরা আমাদের অস্তিত্ব বিক্রি করতে আগ্রহী নই'।

সম্মেলন চলার সময়েই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। শেখ হাসিনাকে বারাক ওবামা ও গর্ডন ব্রাউনের টেলিফোন, বাংলাদেশকে আলাদাভাবে বিশেষ সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কিংবা আলাদাভাবে যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্কের মতো দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের বৈঠক, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা তহবিল ব্যবস্থাপনার কাজে বিশ্বব্যাংককে যুক্ত করার বাংলাদেশী পরামর্শ ইত্যাদি কারণে অভিযোগ উঠেছে যে বাংলাদেশের সমর্থন ধনী দেশগুলো কিনে নিয়েছে। কোপেনহেগেন সম্মেলন উপলক্ষে পরিবেশবাদীদের বের করা বিশেষ পত্রিকা 'ক্লাইমেট ক্রনিকলস' এর চতুর্থ সংখ্যায় অভিযোগ তোলা হয়েছে : "যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি 'সচেতনতা কিট' বাংলাদেশকে সরবরাহ করেছে যাতে 'কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও দেন-দরবারের সময় বাংলাদেশ দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে'। এর সাথে আরও যুক্ত ছিল ঢাকা ও লন্ডনে অনুষ্ঠিত অনেকগুলো নীতি-নির্ধারণী সেমিনার। ডেনিস দূতাবাস বাংলাদেশের ১২৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলের কোপেনহেগেন যাত্রার খরচের জন্য দিয়েছে ১.১৪ মিলিয়ন ডেনিস মুদ্রা। এ অর্থ দেওয়া হয়েছে জেনেভায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনসারভেশন অব নেচার বা আইইউসিএন-র মাধ্যমে।"

বাজার দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্বিরোধ

বড় সাম্রাজ্যবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাজার দখল নিয়ে একটা বিরোধ আছে। এবারের কোপেনহেগেন সম্মেলনেও সে বিরোধ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমানে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক মহা সংকটকাল অতিক্রম করছে। কোপেনহেগেন সম্মেলন অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন বা কার্বন নিঃসরণকেও ওই সংকট উত্তরণের একটা হাতিয়ার হিসাবেই তারা ব্যবহার করতে চেয়েছে। এ বিষয়টি বোঝার জন্য আমাদের তাকাতে হবে মহান মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষার দিকে। আজ থেকে দেড়শ' বছরেরও বেশি সময় আগে মানবজাতির ভবিষ্যত গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁরা

তুলে ধরেছিলেন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অসারতা। তাঁরা দেখিয়েছিলেন – "... নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও সম্পত্তি-সম্পর্কসহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ – ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই জাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্কের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের যা মূলশর্ত সেই মালিকানা-সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার আরো বেশি করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। এইসব সংকটে শুধু যে উপস্থিত উৎপন্নের অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস হয়। এইসব সংকটের ফলে এমনই এক মহামারী হাজির হয় অতীতের সকল যুগে যা অসম্ভব গণ্য করা হত – অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়; মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল জীবনধারণের সমস্ত উপায়-সরবরাহের পথ, শিল্প-বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল; কী কারণে? কারণ, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে, জীবনধারণ সামগ্রীতে দেখা দিয়েছে অতিপ্রাচুর্য, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে, বুর্জোয়া মালিকানার শর্ত বিকাশে তা আর সাহায্য করছে না; বরং যে শর্তে সে শৃঙ্খলিত ছিল তার তুলনায় এ শক্তি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রবল; শৃঙ্খলের বাধা কাটিয়ে ওঠা মাত্র তা সমস্ত বুর্জোয়া-সমাজে এনে ফেলে বিশৃঙ্খলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায়? একদিকে, উৎপাদন-শক্তির বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নষ্ট করে ফেলে, অপরদিকে নতুন বাজার দখল করে এবং পুরানো বাজারের পূর্ণতর শোষণে। অর্থাৎ বলা যায় যে আরও ব্যাপক আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে।" (মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার)

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো একদিকে অতি-উৎপাদন এবং তার পরিণতিতে বাজার সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ সংকট কাটাতে তারা একদিকে বাজার দখল নিয়ে পরস্পরের সাথে বিরোধে লিপ্ত হচ্ছে, অন্যদিকে শুধু নিজেদের নয় অন্যান্য দেশের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করারও চেষ্টা করছে। কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের নামে বাস্তবে তারা এ কাজটি করতেই চায়। দশ বছর আগেও পরাশক্তি হিসাবে পৃথিবীব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে একচ্ছত্র ভূমিকা ছিল, আজ আর তা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা পতনোন্মুখ। কিন্তু তাকে হঠিয়ে অন্য কোনো শক্তিও এককভাবে উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো একে অপরের সাথে জোট বেঁধে তৃতীয় কোনো পক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। কোপেনহেগেনে তারই আভাস দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুপ্ত ইচ্ছা ছিল কার্বন নিঃসরণ কমানোর নামে চীন, ভারতের মত উদীয়মান পরাশক্তির উৎপাদনী কর্মকাণ্ডে লাগাম পড়ানো এবং কার্বন নিঃসরণের মাত্রা তদারকির নামে ওই দেশগুলোতে অবাধে গোয়েন্দাবৃত্তি চালানো। অন্যদিকে, এটা বুঝতে পেরে চীন, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা মিলে যে কোন আইনি কাঠামো নির্মাণের তীব্র বিরোধিতা করে। আর দু'পক্ষের শিল-নোড়ার মত ঘষাঘষির মাঝে পড়ে বাংলাদেশের মত নিরীহ দেশগুলো অসহায়ভাবে ডুবতে বসেছে।

কোপেনহেগেন দলিলের অসারতা

কোপেনহেগেন দলিলের সফলতা-ব্যর্থতার বিষয়টি আলোচনার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত দিনের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। কারণ এবারের দলিলের মূল উদ্যোক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হয় কিয়োটো প্রটোকল। এ প্রটোকল ছিল গ্রিন হাউজ নিঃসরণের মানমাত্রা নির্ধারণকারী আইনি দলিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দলিলে কখনোই স্বাক্ষর করেনি। ২০০১ সালে সে স্পষ্টভাবে নিজেকে কিয়োটো প্রটোকল থেকে সরিয়ে আনে। এবারও কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল দাবি কার্বন নিঃসরণ কমানোর আইনি ঘোষণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন ও ব্রাজিলকে সাথে নিয়ে তথাকথিত এই রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল উত্থাপন করে সম্মেলন শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। ১৮৯টি দেশ কর্তৃক সমর্থন পাওয়া এ রাজনৈতিক দলিল সব রাষ্ট্রের সমর্থন পায়নি। তাই এটি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কোনো দলিল নয়। এমনকি কোনো কোনো দেশের অভিযোগ, এর প্রস্তাবনা জাতিসংঘের রীতিনীতির বিরুদ্ধে এবং কার্যত এটি জাতিসংঘের বিরুদ্ধে একটি 'ক্যু'। দলিলটি বিশ্লেষণ করলে যে ত্রুটিগুলো বেরিয়ে আসে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

এক : যখন ডুবে যাওয়ার মুখে নিরুপায় দ্বীপদেশ এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলো নিজেদের অস্তিত্ব ও জীবন রক্ষার্থে কার্বন নিঃসরণ কমানো আইনি বাধ্যবাধ্যকতা দাবি করছে তখন দীর্ঘ সময় পার করে আইনি বাধ্যবাধকতা নেই এমন রাজনৈতিক দলিল গ্রহণ করা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এটি অনেকটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারের মতো যার কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না। এ সমঝোতার বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে টুভালুর প্রতিনিধি ইয়ান ফ্রাই-এর কণ্ঠে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের অবস্থা টাইটানিক জাহাজের মতো। আমরা দ্রুত ডুবে যাচ্ছি। এখনই কিছু করা দরকার। কিন্তু এর মধ্যে একদল বলছে, আমরা ডুবছি কিনা সেটা নিয়ে আরও আলোচনা করার আছে।'

দুই : যেহেতু এটি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত কোনো দলিল নয় তাই এর ভিত্তিতে পরবর্তী আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ২০১০ সালে মেক্সিকোয় একটি আইনগত দলিল পাওয়ার আশা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। একই সাথে কার্বন নিঃসরণের বিরুদ্ধে আদৌ কোনো কার্যকর আইনি দলিল গৃহীত হবে কিনা তা নির্ভর করবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অন্তর্বিরোধের ধরনের ওপর।

তিন : এ দলিল বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ধরে রাখার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব স্বীকার করলেও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো অঙ্গীকার করে নি। দলিলে কেবল সাম্য ও টেকসই উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ - ১)। এমনকি কবে থেকে নিঃসরণের চূড়ান্ত মাত্রা ক্রমান্বয়ে নামিয়ে আনা হবে তাও উল্লেখ করা হয় নি (অনুচ্ছেদ - ৩)। যদিও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের প্রস্তাবিত নিঃসরণ হ্রাসের মাত্রা ৩১ জানুয়ারি ২০১০ নাগাদ জাতিসংঘ সচিবালয়ে জানাতে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু সে হ্রাসের ন্যূনতম মাত্রা কী হবে তার কোনো উল্লেখ করা হয় নি। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া ২০১০ সাল নাগাদ নিঃসরণ হ্রাসের যে মাত্রা প্রস্তাব করেছে, আইপিসি'র প্রস্তাবনার তুলনায় তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। সেই সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে নিঃসরণ হ্রাসের মাত্রা নির্ধারণ করা থাকলেও তা পালনে ব্যর্থ হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলো। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতো ওই প্রটোকল স্বীকারই করেনি।

চার : এ দলিল শিল্পোন্নত দেশগুলো ছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের তাগিদ দিয়েছে এবং এ বিষয়ে গৃহীত কর্মসূচি এ বছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে জাতিসংঘ সচিবালয়ে জানাতে আহ্বান করা হয়েছে। দলিলটির প্রস্তাবনা অনুযায়ী শিল্পে অনুন্নত দেশগুলো এবং বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাগ্রস্ত দেশগুলো যারা কোনোভাবেই ক্ষতিকর কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী নয় তারাও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিঃসরণ হ্রাসের ব্যবস্থা করবে। শিল্পোন্নত দেশগুলো কার্বন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে নিঃসরণ কমাবে – এমন কোনো প্রতিশ্রুতি না দিলেও শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিকে বন উজাড় রোধ এবং নতুন বনায়নের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে। বনায়নের এ কর্মসূচিটি যেহেতু জাতিসংঘের অধীনে প্রণীত দলিলের কর্মসূচি নয় তাই প্রস্তাবিত 'কোপেনহেগেন গ্রিন ফান্ড'ও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। ফলে এ দলিলের অধীনে প্রদত্ত সাহায্যের সব প্রতিশ্রুতিও অনিশ্চিত। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিজেদের নানা (রাজনৈতিক-সামরিক-অর্থনৈতিক) স্বার্থে এ সাহায্য প্রতিশ্রুতিকে ব্যবহার করবে।

পাঁচ : এ দলিলে জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে শিল্পোন্নত দেশগুলো কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পর্যাপ্ত, অনুমেয় এবং টেকসই সমর্থন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও 'পর্যাপ্ততা'র কোনো মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় নি। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অভিযোজনের জন্য অর্থপ্রাপ্তির আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা আগামী তিন বছরে (২০১০-২০১২) ভারসাম্যমূলক প্রশমন (বিশেষত বন উজাড়) ও অভিযোজনের কাজে ব্যয় করা হবে। অভিযোজনের সঙ্গে প্রশমনের শর্ত জুড়ে দেওয়ায় এবং অর্থের বিনিয়োগ 'আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান'-এর মাধ্যমে করার ঘোষণায় (অনুচ্ছেদ - ৮) অভিযোজনের প্রয়োজনীয় অর্থপ্রাপ্তির এবং এর ওপর অনুন্নত দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এ সহযোগিতার বিষয়টিও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর হাতেই তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ভূমিকায় ব্যবহৃত হবে।

ছয় : ২০২০ সাল নাগাদ প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কার্বন নিঃসরণ প্রশমনের জন্য, অভিযোজনের কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। বলা হয়েছে, প্রশমনের বাস্তবতা বিবেচনায় এবং এ বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উন্নত বিশ্ব ২০২০ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রয়োজন মেটাতে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল সংগ্রহ করবে। যেহেতু বাংলাদেশসহ ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর কার্বন নিঃসরণ মাত্রা একেবারেই নগণ্য, তাই সঙ্গত কারণেই ধারণা করা হচ্ছে, প্রশমনের জন্য প্রস্তাবিত এ অর্থের প্রধান দাবিদার হবে উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষত ভারত, চীন ও ব্রাজিল (এ প্রস্তাবের যারা মার্কিন সহযোগী)।

সাত : প্রশমনের জন্য ‘বন উজাড় রোধ’কে বেছে নিলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তরের বিষয়ে এ দলিল ‘পদ্ধতি’ প্রণয়নের কথা বলেই দায় শেষ করেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকারকে (গ্যাট ও ট্রিপস) অজুহাত করে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কঠোর অবস্থান ইতিবাচক পরিবর্তনকে সবসময়ই বাধাগ্রস্ত করেছে।

আট : এ দলিলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় থাকা বিপুল জনগোষ্ঠীর আইনি সুরক্ষার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয় থেকে হিমালয় পর্বতমালা, সুন্দরবন ইত্যাদিসহ দুনিয়াজুড়ে ছড়ানো মানবজাতির অভিন্ন উত্তরাধিকার বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কোনো বক্তব্য এ দলিলে নেই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)